বণিকবার্তা
সংকলন
৬২৮
মঙ্গলবার। ২৯ এপ্রিল ২০২৫
১৬ বৈশাখ ১৪৩২
৩০ শাওয়াল ১৪৪৬

Daily ePapers
BD
Click here to join the channel

সিরাজ-উদ-দৌলার পরিবার

সিরাজ-উদ-দৌলার পূর্বপুরুষ

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া

১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের কথা। ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের (১৬০৫-২৭ খ্রি.) দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা খুররমের (পরে সম্রাট শাহজাহান ১৬২৭-৫৭ খ্রি.) তৃতীয় পুত্র শাহজাদা আওরঙ্গজেবের (পরে সম্রাট ১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) জন্য একজন ধাত্রীমাতা নিযুক্ত করা হয়েছে সমাজের উঁচুতম স্তরে প্রচলিত রীতি অনুসারে। ভারত সম্রাটের পৌত্রকে স্তন্যদান করার জন্য তো যাকে খুশি তাকে নিযুক্ত করা যায় না। তাই তুর্কি আফশার গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় নারীকে বেছে নেয়া হয়েছে অনেক বিচার-বিবেচনার পর। অবশ্য সেই নারীর নামটি কোনো সূত্র থেকেই উদ্ধার করা যায়নি।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার প্রপিতামহের আগে এ বংশের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে ইউসুফ আলি খান রচিত তারিখ-ই-বঙ্গালা-ই-মহাব্বত জঙ্গি সংক্ষেপে তারিখ গ্রন্থ থেকে জানা যায়, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার প্রপিতামহ ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের কোকলতাশ-মনসবদার একসময় (১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে) সুবাহ বাংলার সুবাদারও নিযুক্ত হয়েছিলেন প্রায় এক বছরের জন্য। এ পরিবারের আর্থিক অবস্থা যে প্রথমদিকে খুবই সচ্ছল ছিল, সেই প্রমাণ পাওয়া যায় এ পরিবারে ওপরে উল্লেখিত অনেক উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন গৃহজাত ভৃত্যের অস্তিত্ব দেখে এবং তাদের সামাজিক উঁচু মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায় মির্জা মোহাম্মদ শাহ কুলি খানের প্রথম স্ত্রীর (হাজি আহমদ ও আলিবর্দি খানের জননী) বাবার বংশপরিচয় দেখে। এই নারীর পিতা ছিলেন অভিজাত বংশীয় সৈয়দ জয়নাল আবেদিনেরও পিতা। মির্জা মোহাম্মদ শাহ কুলি খান ও তার দুই পুত্র সম্রাটতনয় শাহজাদা আজমের গৃহে সম্মানজনক চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন।

১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের ফলে মির্জা মোহাম্মদ শাহ কুলি খানের পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে চরম দুর্দশায় পতিত হয়। সেই বর্ণনা সমসাময়িক কালে রচিত তারিখ, মোজাফ্ফরনামা, রিয়াজ, সিয়ার প্রভৃতি গ্রন্থে আছে।

নবাব আলিবর্দি খান

নওয়াজিশ মোহাম্মদ খানের সমাধি

'কোকলতাশ' অর্থাৎ সম্রাটের ধাত্রীমাতার সন্তান। কিন্তু সম্রাটের সেই দুধভাইয়ের নামের উল্লেখ সেখানে নেই।

সম্রাটের কোকলতাশের নাম তাৎক্ষণিকভাবে না পাওয়া গেলেও তার একমাত্র পুত্র যে মির্জা মোহাম্মদ ছিলেন, তা তারিখ-এ অতি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে এবং তিনি যে একসময় সম্রাটের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা আজমের 'শিলাক্কী' অর্থাৎ 'খানসামা' ছিলেন, সে কথাও সেখানে বলা হয়েছে। মোজাফ্ফরনামায় তার নাম যে শাহ কুলি খান ছিল, তার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। একই গ্রন্থমতে তিনি ছিলেন শাহজাদা আজমের স্বর্ণালংকার দপ্তরের অধ্যক্ষ এবং তার স্ত্রী একই শাহজাদার গৃহে 'পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন।' তখন তাদের যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তার নাম ছিল মির্জা মোহাম্মদ আলি। তারিখ মতে, এই মির্জা মোহাম্মদ আলির জন্ম হয়েছিল দাক্ষিণাত্যের এক স্থানে এবং এর ১০ বছর আগে সম্রাট আলমগীরের রাজত্বের প্রথম দিকে তাদের যে প্রথম পুত্রের জন্ম হয়, তার নাম ছিল মির্জা আহমদ (পরে তিনি হাজি আহমদ নামে পরিচিত হন)। মির্জা মোহাম্মদ ও শাহ কুলি খান—এই উভয় নামই ছিল খুব সম্ভব সিরাজের প্রপিতামহের। সে কারণেই বোধ হয় সিরাজ 'মনসুর-উল-মুলক মির্জা মোহাম্মদ শাহ কুলি খান সিরাজ-উদ-দৌলা হয়বত জং বাহাদুর' নাম ও উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

মির্জা মোহাম্মদ শাহ কুলি খান ছিলেন বড় ধরনের একজন মনসবদারের পুত্র এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের সেই

১৬৬৪ কি ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী হাজি আহমদের বয়সও তখন প্রায় ৪০ বছর। তারও ছিল দুই সংসার। প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত তিন পুত্র ছিলেন মোহাম্মদ রেজা (পরে নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান), মোহাম্মদ সাঈদ (পরে সাঈদ আহমদ খান) ও মোহাম্মদ হাশিম (পরে জয়েন-উদ-দীন আহমদ খান)। হাজি আহমদের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরা ছিলেন রাবেয়া বেগম ও আরেকটি কন্যা। মির্জা মোহাম্মদ আলির (আলিবর্দি খান) ছিল তিনটি কন্যা, যথা মেহের-উন-নিসা (ঘসেটি বেগম), মোমেনা বা ময়মনা বেগম ও আমিনা বেগম।

১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধের পর মির্জা মোহাম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা আহমদ হেজাজের পথে বের হয়ে পড়েন এবং সেখানে কয়েক বছর অতিবাহিত করে পরে ফিরে আসার পর হাজি আহমদ নামে পরিচিতি লাভ করেন। হাজি আহমদের চেয়ে ১০ বছরের কনিষ্ঠ মির্জা মোহাম্মদ আলির (আলিবর্দি খান) বয়স ছিল তখন (১৭০৭ খ্রি.) ৩২ কি ৩৩ বছর। তখন তিনি বিবাহিত এবং তখন তার জ্যেষ্ঠ কন্যা মেহের-উন-নিসার (ঘসেটি বেগম) জন্ম হয়ে থাকলেও অন্য দুই কন্যা মোমেনা বেগম ও আমিনা বেগমের যে জন্ম হয়নি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তিনি যখন ১৭২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মুর্শিদাবাদ হয়ে ওড়িশার কটকে গিয়েছিলেন, তখন তার কন্যা তিনটি, তাদের জননী ও তাদের খানাজাত ভৃত্য ফকির উল্লাহ বেগ খান ও নূর উল্লাহ বেগ খান যে তার সঙ্গে এসেছিলেন, সে কথা সমসাময়িক ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের সেই ভয়াবহ যুদ্ধের পর সম্রাট শাহ আলম বাহাদুর শাহ প্রায় পাঁচ বছর (১৭০৭-১২ খ্রি.), তার পুত্র মুয়াজ-উদ-দীন জাহান্দার শাহ এক বছর (১৭১২-১৩ খ্রি.), সম্রাটের পৌত্র সম্রাট ফররুখ সিয়ার প্রায় ছয় বছর (১৭১৩-১৯ খ্রি.) রাজত্ব করেছিলেন। এই সুদীর্ঘ ১২ বছরের অধিক কাল মির্জা মোহাম্মদের গোটা পরিবারের আর্থিক, সেই সঙ্গে সামাজিক অবস্থা যে কী চরম সংকটে পড়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়। তাদের প্রত্যেকেই হয়তো নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে গেলেও তাদের কোনো প্রচেষ্টাই যে সাফল্যের মুখ দেখেনি, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। হাজি আহমদের কথা বিশেষ কিছুই জানা না গেলেও মির্জা মোহাম্মদ আলি (আলিবর্দি খান) যে ওয়ালিশাহিত বাহিনীতে যোগদান করেছিলেন, সে সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এ কাজ তার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে বলে তা তিনি পরিত্যাগ করেন। তিনি এবং তাদের সবাই শাহজাদা আজমের লোক ছিলেন বলে তারা সম্রাটের দরবারের পক্ষ থেকে কোনো সহায়তা পাননি বলে দেখা গেছে।

অভাবের তাড়না আর সহ্য করতে না পেরে মির্জা মোহাম্মদ আলি ভাগ্যান্বেষণে বাংলা ও ওড়িশার দিকে ছুটে যান। এ সম্বন্ধে তারিখ, মোজাফ্ফরনামা প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা গেলেও মির্জা মোহাম্মদের গোটা পরিবারটাই যে ওড়িশা ও বাংলায় এসেছিল, সে ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য দেখা যায় না।

নবাব মুর্শিদ কুলি জাফর খানের বেগমের উপদেশ অনুসারে মির্জা মোহাম্মদ আলি তার বেগম (শরফ-উন-নিসা), তাদের তিন কন্যা ও ভৃত্যদের নিয়ে কটক অভিমুখে যাত্রা করেন। তারিখ-এ বর্ণিত আছে, তার পিতা মির্জা মোহাম্মদের আমন্ত্রণেই মির্জা মোহাম্মদ আলি মুর্শিদাবাদ হয়ে কটকে গিয়েছিলেন এবং তার পিতা আগে থেকেই সেখানে অবস্থান করছিলেন। মোজাফ্ফরনামার বর্ণনায় আছে, [মির্জা মোহাম্মদ] শাহ কুলি খান [দিল্লি থেকে] নবাব সুজা খানের অনুগামী হয়েছিলেন। এ ঘটনা সত্য হলেও তা খুব আগের ঘটনা বলে ধরা যায় না। কারণ সুজা খান কটকের সুবাদারি পেয়েছিলেন এর সামান্য আগে।

কটকে আগমনের পর নবাব সুজা খান মির্জা মোহাম্মদ আলির প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করেন। তারিখ-এর বর্ণনামতে, সুজা খান প্রথমে তাকে মাসিক ১০০ টাকা বেতনের একটি চাকরি দেন এবং পরে তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে নিজ রাজ্যের একটি উৎকৃষ্ট অংশে ফৌজদার পদে নিযুক্ত করেন।

পরের বছর অর্থাৎ ১১৩২ হিজরি (১৭২০-২১ খ্রি.) সনে নবাব মির্জা মোহাম্মদের অনুরোধে হাজি আহমদকে সপরিবারে কটকে আগমনের জন্য একটি পরোয়ানা পাঠান।

১৬৬৪ অথবা ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী হাজি আহমদের বয়স ছিল তখন প্রায় ৫৫ বছর এবং তার পিতা মির্জা মোহাম্মদের বয়স তখন ৭৫ বছরের মতো ছিল বলে ধরা যেতে পারে। এ বয়সে মির্জা মোহাম্মদ কোনো চাকরিতে নিয়োজিত হয়েছিলেন কিনা সেই উল্লেখ কোথাও নেই। তবে হাজি আহমদ সম্পর্কে দুটি ভিন্ন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এক মতে, তিনি মাসিক ৫০ টাকা বেতনে একটি চাকরি পান। অন্য মতে, 'নবাবকে দিনরাত সঙ্গদান ছাড়া তার অধীনে কোনো চাকরি গ্রহণ করার ব্যাপারে হাজি সাহেব অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।' যোগ্যতা অনুসারে তার পুত্রদের চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করার পর হাজি আহমদ তার ভাইয়ের উন্নতির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।

সে সময়ে হাজি আহমদের বয়স প্রায় ৫৫ বছর ছিল। তার পিতা মির্জা মোহাম্মদের বয়স তখন প্রায় ৭৫ ছিল। তবে হাজি আহমদের তিন পুত্র ও মির্জা মোহাম্মদ আলির তিন কন্যার বয়স তখন কত ছিল, সেই উল্লেখ কোথাও নেই। তবে সিয়ার-এর একটি উক্তি থেকে জানা যায়, সাঈদ আহমদ খান যখন ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে পূর্ণিয়াতে মারা যান, তখন তার বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। সেই হিসাবে তিনি ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে ধরা যেতে পারে।

সিয়ার রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন খান প্রায় সাত

● এরপর পৃষ্ঠা ৬

প্রচ্ছদ : সিরাজ-উদ-দৌলা ও তার পরিবারের কয়েকজন সদস্যের প্রতিকৃতি অবলম্বনে

আমিনা বেগম ও পুত্রদের করুণ পরিণতি

মাহফুজ রাহমান

রক্তাক্ত মাটিতে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার নিথর দেহ যখন লুটিয়ে পড়েছিল, তখন পলাশীর প্রান্তর শুধু এক তরুণ শাসককে হারায়নি। ডুবে গিয়েছিল এক গৌরবময় বংশের সর্বশেষ প্রদীপগুলোও। মৃত্যু এসেছিল নিঃশব্দে, প্রতারণার বিষাক্ত নিশ্বাসে। সিরাজের পতনের মুহূর্তে যাদের চোখে ছিল শেষ আশা, তারা একে একে নিভে গিয়েছিল—মা আমিনা বেগম, ভাই ফজল কুলি খান, সর্বকনিষ্ঠ মির্জা মাহদী। তাদের অপরাধ ছিল কেবল একটি বংশের উত্তরাধিকার হওয়া।

আমিনা বেগমের জন্ম আনুমানিক ১৭২০-২২ সালে মুর্শিদাবাদে। নবাব আলিবর্দি খানের প্রভাব আরো মজবুত করার কৌশল হিসেবে আমিনার বিয়ে হয় পাটনার গভর্নর জয়েন-উদ-দীন আহমদের সঙ্গে, যিনি সম্পর্কে ছিলেন তার চাচাতো ভাই। এ দম্পতির তিন পুত্র মির্জা মুহাম্মদ (পরবর্তী সময়ে সিরাজ-উদ-দৌলা), ফজল কুলি খান (ইকরাম-উদ-দৌলা) ও মির্জা মাহদী। রাজনীতির সূক্ষ্ম বোধ আর দরবারি কূটনীতির দক্ষতা ছিল আমিনা বেগমের।

ব্রিটিশ সামরিক কর্মকর্তা ও ইতিহাসবিদ স্যামুয়েল চার্লস হিল (এসসি হিল) তার 'বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-৫৭' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'আমিনা ছিলেন এক ব্যতিক্রমী নারী—রাজনীতির জটিল অংকে পারদর্শী।' অনেক ইতিহাসবিদের মতে, তার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি তখনকার পুরুষপ্রধান রাজনীতিতে বিস্ময়কর ছিল। পলাশীর প্রান্তরে সিরাজের পরাজয় ও হত্যার পরই মীর জাফরের পুত্র মীরনের নির্দেশে আমিনা বেগমকে বন্দি করা হয়। মীরন আশঙ্কা করেছিলেন, সিরাজের পরিবারের অন্য সদস্যরা বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে তারা বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে উঠতে পারেন। ফলে বাংলার একসময়ের মহীয়সী রানী পরিণত হন এক ভগ্নপ্রায় কারাকক্ষে থাকা বন্দিনীতে। বন্দিদশায় তার জীবন হয়ে ওঠে অসহনীয়। সাধারণ দাসীর মতো খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে হতো তাকে। এসসি হিল লিখেছেন, 'একসময়ের মহিমান্বিত রানী আমিনা শেষ দিনগুলোয় সাধারণ চাকরানীর মতো খাবারের জন্য অপেক্ষা করতেন। এমনকি তার কান্না শোনার কেউ ছিল না।'

১৭৬০ সালে আমিনা বেগমকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। এমনকি তার কোনো স্মৃতিচিহ্নও রাখা হয়নি। যদিও তার হত্যা নিয়ে নানা তথ্য মেলে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গোপন নথির (ফোর্ট উইলিয়াম লেটার্স, ১৭৫৮) বিবরণে বলা হয়েছিল, 'সাবজেক্ট নং ১ (আমিনা বেগম)-কে ডিনারে আর্সেনিক মিশ্রিত মিষ্টান্ন দেয়া হয়েছিল। মৃত্যু ঘটে ১২ ঘণ্টা পর।' প্রসঙ্গত এটি ছিল ব্রিটিশদের পছন্দের পদ্ধতি।

প্রখ্যাত ভারতীয় ইতিহাসবিদ যাদুনাথ সরকার তার 'দ্য ফল অব দ্য মুঘল এম্পায়ার' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আমিনা বেগমকে নির্জন প্রকোষ্ঠে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। তার মৃত্যুর পর কোনো সরকারি ঘোষণা দেয়া হয়নি, প্রথাগত দাফন-কাফনের ব্যবস্থাও করা হয়নি।' এসসি হিল ও যাদুনাথ সরকারের মতো গবেষকরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে আমিনা বেগমকে গভীর রাতে গোপনে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল। তার মরদেহ নীরবে সমাহিত করা হয়। তবে ভিন্ন একটি বর্ণনাও পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, সিরাজের পতনের পর আমিনা বেগমকে মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকা নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। পরে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ নেয়ার পথে তার নৌকা ডুবে যায়। তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তবে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ মনে করেন নৌকাডুবির গল্পটি অনেকটাই লোককথানির্ভর। সমসাময়িক প্রমাণের অভাবে একে ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে গণ্য করা হয় না।

প্রথাগত মোগল রীতি অনুসারে, রাজপরিবারের সদস্যদের 'সম্মানজনক' মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো শ্বাসরোধের মাধ্যমে। গোলাম হোসেন সালিম তার 'রিয়াজ-উস-সালাতীন'-এ লিখেছেন : 'নবাব-মাতাকে রেশমের ফিতে দিয়ে শাহী পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়।'

আমিনা বেগমের আরেক পুত্র ফজল কুলি খানের জন্মের বছরটি সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে ধারণা করা হয় তিনি ১৭৩৫-৩৭ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন মুর্শিদাবাদের রাজপ্রাসাদে। ছোটবেলা থেকেই তাকে রাজকীয় রীতিনীতি ও প্রশাসনিক শিক্ষার মধ্যে বড় করা হয়েছিল। সিরাজের তুলনায় ফজল কুলি খান ছিলেন অনেক বেশি শান্ত, বিচক্ষণ ও সংযত। তিনি কখনো আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত নিতেন না, বরং ধীরে বিবেচনা করেই কাজ করতেন, যা তাকে দরবারের প্রাজ্ঞদের কাছে

আমিনা বেগম ছবি : বাংলার বেগম (১৯১২)

খুশবাগে আমিনা বেগমের সমাধি

বিশেষ সম্মাননীয় করে তুলেছিল।

যাদুনাথ সরকার ফজল কুলিকে বর্ণনা করেছেন, 'তিনি ছিলেন নম্র, বুদ্ধিদীপ্ত ও সহিষ্ণু চরিত্রের অধিকারী। সিরাজের স্থলে যদি ফজল কুলি ক্ষমতায় আসতেন, তাহলে হয়তো বাংলার ইতিহাসের ধারা পাল্টে যেত।'

সিরাজের পতনের পর মীর জাফর ও মীরনের কূটচক্রের নজরে পড়েন ফজল কুলি খানও। তাকে মুর্শিদাবাদের রাজপ্রাসাদে বন্দি করে রাখা হয়। ছোট কক্ষে একাকী তাকে রাখা হয়েছিল। তার ওপর কঠিন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। কোনো আত্মীয় বা সমর্থকের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি ছিল না। খাদ্য-পানীয় ছিল অত্যন্ত সীমিত। এ পরিস্থিতিতে ফজল কুলির স্বাস্থ্য দ্রুত ভেঙে পড়তে শুরু করে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফজল কুলি খানের স্বাস্থ্য এতটাই খারাপ হয়ে পড়ে যে তিনি আর চলাফেরা করতে পারতেন না। যাদুনাথ সরকারের বর্ণনায়, 'ফজল কুলিকে ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পরে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়, যেন তার মৃত্যু স্বাভাবিক মনে হয়।'

এসসি হিলের বর্ণনায়, 'ফজল কুলি খানকে ধীরে ধীরে শারীরিক এবং মানসিকভাবে ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা অনুসরণ করা হয়েছিল।' (বেঙ্গল ইন সেভেনটিন ফিফটি সিক্স-ফিফটি সেভেন)

রাতের অন্ধকারে গোপনে তার দেহ দাফন করা হয়েছিল। কোনো জানাজা, কোনো স্মৃতিচিহ্ন কিছুই রাখা হয়নি। প্রখ্যাত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ও গবেষক রোজি লিউয়েলিন-জোন্স লিখেছেন, 'একজন সম্ভাবনাময় রাজপুত্রকে রাতের অন্ধকারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল, যেন কোনোদিন পৃথিবীতে তার অস্তিত্বই ছিলই না।' (সূত্র : দ্য লাস্ট নবাব অব বেঙ্গল)

সিরাজের সর্বকনিষ্ঠ ভাই মির্জা মাহদীর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি ছিলেন সাদাসিধে ও ধর্মপরায়ণ। রাজনীতির জটিল কূটচাল থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন, ব্যস্ত থাকতেন সাহিত্যচর্চায়। মির্জা মাহদী যে কবিতা লিখতেন তা প্রমাণিত। ঠিক কতটি কবিতা তিনি লিখেছিলেন তার নির্ভরযোগ্য সংখ্যা বা সংগ্রহ ইতিহাসে টিকে নেই।

ইতিহাসবিদ সুদীপ চক্রবর্তী তার গ্রন্থ 'পলাশি : দ্য ব্যাটল দ্যাট চেঞ্জড দ্য কোর্স অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি' বইয়ে মাহদীর চরিত্রায়ণ করেন, 'মাহদী ছিলেন রাজপ্রাসাদের নিষ্ঠুর রাজনীতির জগতে বেড়ে ওঠা শেষ নির্মল আত্মা।'

কিশোর মাহদী ছিলেন সবচেয়ে করুণ পরিস্থিতির শিকার। তাকে হত্যার জন্য ক্ষমার অজুহাতে ডেকে আনা হয়। এসসি হিল লেখেন, 'মাহদীর মুখ থেকে একটি শব্দ বের হওয়ার আগেই তাকে গলাকেটে হত্যা করা হয়। এ নির্মমতায় মানবতার সকল সীমা লঙ্ঘন করেছিল মীরন।'

মির্জা মাহদীর বিরুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বা সামরিক প্রস্তুতির অভিযোগ ছিল না, তবু কেবল তার রক্তের কারণে তাকে একটি সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে দেখা হয়। এসসি হিল উল্লেখ করেছেন, 'যদি রক্তের সূত্রে সামান্যতম সম্ভাবনাও থেকে যায়, তবে সে সম্ভাবনাকেও নির্মূল করতে হবে—এই ছিল মীরনের দৃষ্টিভঙ্গি।'

তার মৃত্যুর পরে কোনো নিয়মনীতি মেনে দাফন করা হয়নি। গভীর রাতে তার মরদেহ গোপনে সমাহিত করা হয়েছিল।

ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের গোপন নথিপত্রে (১৭৫৭-৫৮) মির্জা মাহদীকে নিয়ে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য মন্তব্য পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছিল, 'মির্জা মাহদী তার ভাইয়ের চেয়েও বিপজ্জনক। নবাব তলোয়ার দিয়ে লড়েন। কিন্তু এই মানুষটি এজন্য তার কলম ও যোগাযোগকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন।' তাকে গুপ্তচর হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল নথিগুলোয়। ফোর্ট উইলিয়াম রেকর্ডস থেকে স্পষ্ট যে মির্জা মাহদী ছিলেন ব্রিটিশদের জন্য একটি বুদ্ধিবৃত্তিক হুমকি। মির্জা মাহদীর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিল আঠারো শতকের বাংলার সবচেয়ে মূল্যবান বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ। ফার্সি, আরবি ও সংস্কৃতে রচিত চার হাজারের বেশি দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি এ সংগ্রহে ছিল। ব্রিটিশরা ১৭৫৮ সালে এ গ্রন্থাগার পুড়িয়ে ফেলেছিল। বিশিষ্ট ভারতীয় ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. সুভাষ চন্দ্র মিত্র তার 'বেঙ্গল'স ফরগটেন স্পাই নেটওয়ার্ক' গ্রন্থে লিখেছেন 'ফোর্ট উইলিয়াম রেকর্ডস প্রমাণ করে যে মির্জা মাহদী শুধু একজন পণ্ডিতই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলার শেষ গুপ্তচর নেতা। ব্রিটিশরা তাকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার সমস্ত রচনা ধ্বংস করে দিয়েছিল।'

আমিনা বেগম, ফজল কুলি খান বা মির্জা মাহদী কোনো যুদ্ধ করেননি, কোনো ষড়যন্ত্র আঁটেননি; তবু রক্তের অপরাধে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। হয়তো ভাগীরথীর জল আজও কাঁপে সেসব রাতের স্মৃতিতে। আমিনা বেগমের শেষ কান্না, ইকরামের রুদ্ধপ্রাণ আর্তনাদ, মির্জা মাহদীর ছিঁড়ে যাওয়া কবিতার পাতা হয়তো প্রতিটি বর্ষায় ফিরে আসে রক্তের গন্ধ নিয়ে। কে জানে হয়তো মুর্শিদাবাদের প্রাসাদের দেয়ালে আজও লেগে আছে সে রাতের আর্দ্রতা। কখনো কখনো বৃষ্টির রাতে শোনা যায়—কার যেন রেশমের খসখস শব্দ, কার যেন বিষাদমাখা কোরান তিলাওয়াত। ইতিহাস লিখেছে বিজয়ীরা, কিন্তু ভাগীরথীর তীরে আজও লেখা হয় পরাজিতদের অশ্রু দিয়ে।

মাহফুজ রাহমান : সাংবাদিক, বণিক বার্তা

ঘসেটি বেগম

আলিবর্দি খানের কন্যা সিরাজ-উদ-দৌলার খালা

ঘসেটি বেগম

নিজাম আশ শামস

ঘসেটি বেগমের সমাধি

প্রকৃত নাম মেহের-উন-নিসা বেগম। তবে এ নামে খুব কম মানুষই তাকে চেনেন। ইতিহাসে তিনি পরিচিত ঘসেটি বেগম নামে। নামটি শুনলেই কূচক্রী এক নারীর প্রতিকৃতি ভেসে ওঠে মানসপটে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে বাংলার স্বাধীনতা পরাহত হওয়ার ষড়যন্ত্রে যে জড়িত হয়ে আছে তার নাম। খল হলেও বাংলার ইতিহাসে তিনি অন্যতম শক্তিশালী নারী চরিত্র। এক্ষেত্রে মোগল শাহজাদি জাহানারার পর সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজপরিবারভুক্ত নারীদের মধ্যে তার তুলনা বিরল। আঠারো শতকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার সব গুরুত্বপূর্ণ নায়ক ও শাসকের ভিড়েও যথেষ্ট আলো তিনি নিজের দিকে টেনে নিতে পেরেছিলেন। এতটাই যে তাকে বাদ দিলে বাংলার নবাবি আমলের ইতিহাস অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

নবাব আলিবর্দি খানের মহলে তিনি পরিচিত ছিলেন 'ছোটি বেগম (ছোট বেগম)' নামে। নবাবের তিন কন্যার মধ্যে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠা। অন্য দুজনের নাম যথাক্রমে মায়মুনা বেগম ও আমিনা বেগম। নবাবের কোনো পুত্র ছিল না। তিনি তার তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে নিজের তিন মেয়ের বিয়ে দেন। বড় মেয়ে মেহের-উন-নিসার বিয়ে হয় তার বড় ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজিশ মুহাম্মদ খানের সঙ্গে। আলিবর্দি খান নওয়াজিশকে ঢাকার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেন। সেই থেকে তিনি 'ছোটা নবাব (ছোট নবাব)' হিসেবে অভিহিত হতে থাকেন। আর তার বেগম হিসেবে মেহের-উন-নিসা 'ছোটি বেগম' অভিধা লাভ করেন।

নবাব মহলে ঘসেটি বেগমের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। তার স্বেচ্ছাচারিতা, একরোখা মনোভাব আর রাগের কারণে সবাই তাকে সমীহ করে চলত। স্বয়ং নবাব আলিবর্দি খানের ওপর তার ছিল ব্যাপক আধিপত্য। স্বাধীনচেতা ও উচ্চাভিলাষী ঘসেটি বেগম তার স্বামীর 'ছোটা নবাব' হওয়াটা মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় না গিয়ে মুর্শিদাবাদে পিত্রালয়েই থেকে যান। ঢাকায় কিছুদিন থেকে নওয়াজিশ খানও বেগমের সঙ্গে থাকার জন্য মুর্শিদাবাদে চলে আসেন।

নবাব আলিবর্দি খানের মসনদের অন্যতম দাবিদার ছিলেন তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান। উদারতা ও দানশীলতার কারণে প্রজাদের মাঝে তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। আর ছিলেন মেজ ভ্রাতুষ্পুত্র সাঈদ আহমেদ। তিনি পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। শওকত জং ছিলেন তার সন্তান, যিনি পরবর্তী সময়ে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা হন। সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে ইতিহাসে ঠাঁই হয় তার। ছোট ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন জয়েন-উদ-দীন আহমদ। তিনি সিরাজ-উদ-দৌলার পিতা। ১৭৪৭ সালে কিছু বিদ্রোহী ভাড়াটে আফগান সৈনিকের হাতে তার মৃত্যু হয়। এ কারণে নবাবের সব স্নেহ প্রবাহিত হয় সিরাজ-উদ-দৌলার দিকে। তাই তিনি তার জীবিত দুই ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করে সিরাজ-উদ-দৌলাকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। খুব সম্ভবত এ সময় থেকে সিরাজের সঙ্গে ঘসেটি বেগমের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। এর অন্তত তিনটি কারণ থাকতে পারে। প্রথম কারণ, সিরাজের প্রতি নবাবের সীমাহীন আস্থা ও ভালোবাসা। ঘসেটি বেগম নবাব মহলে একচ্ছত্র আধিপত্য ভোগ করতেন। এমনকি কোনো পুরুষেরও তার ওপর গলা উঁচু করার সাহস ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলা। তাই সিরাজের উত্থানকে তিনি তার জন্য হুমকি মনে করতেন। দ্বিতীয় কারণ, 'ছোটি বেগম' থেকে বড় বেগম হওয়ার অভিলাষ ছিল তার। তার স্বামী নওয়াজিশ খান যদি নবাব হন, তবেই কেবল পূরণ হয় সে স্বপ্ন। স্বাভাবিকভাবেই নবাব আলিবর্দির ওপর এ বিষয়ে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছিলেন তিনি। তার আগে নবাবের কাছে করা কোনো তদবিরে বিফল হতে হয়নি তাকে। কিন্তু এই প্রথম তাকে ব্যর্থতার স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। তার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তৃতীয় কারণ নবাব আলিবর্দির ওপর প্রভাব খাটিয়ে তিনি প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। তার স্বামীর সম্পত্তিও কিছু কম ছিল না। রাজধানী মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে 'মতিঝিল' নামে বিশাল এক দুর্গসদৃশ বাগানবাড়ি ছিল তাদের। ঘসেটি বেগম আশঙ্কা করছিলেন, সিরাজ নবাব হলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবেন। মোট কথা, কারণ যাই হোক না কেন, তিনি সিরাজ-উদ-দৌলাকে ঘৃণা করতেন। সিরাজ ছিল তার চলার পথে প্রধান কাঁটা। এ কাঁটা তিনি উপড়ে ফেলতে চাইছিলেন। সিরাজ ও ঘসেটি বেগমের মধ্যকার সংঘাতের উত্তাপ ভালোভাবেই লেগেছিল নবাব আলিবর্দি খানের গায়ে। এ বিরোধ মেটাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন তিনি। বলা বাহুল্য, তিনি সফল হননি।

সিংহাসনের অন্যতম দাবিদার হিসেবে নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান তার কার্যক্রম শুরু করেন। তার প্রধান উপদেষ্টা হন হোসেন কুলি খান ও রাজা রাজবল্লভ। হোসেন কুলি খান তো আগে থেকেই মুর্শিদাবাদে অবস্থান করছিলেন। এবার রাজবল্লভও তার পুত্রকে ঢাকার দায়িত্ব দিয়ে মুর্শিদাবাদে চলে এলেন। জনগণের মাঝে তার জনপ্রিয়তা তো ছিলই, এখন হোসেন কুলি খান ও রাজবল্লভের মতো ধূর্ত ও চৌকস মন্ত্রী পেয়ে নওয়াজিশের দল হয়ে উঠল অপ্রতিরোধ্য। রাজনীতিতে তিনি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, প্রবল সম্ভাবনা ছিল যে সিংহাসন তিনিই দখল করবেন। কিন্তু একটি ঘটনায় প্রেক্ষাপট বদলে যায়। ঘসেটি বেগম ও নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান দম্পতি ছিলেন নিঃসন্তান। তাই তারা সিরাজ-উদ-দৌলার ছোট ভাই ইকরাম-উদ-দৌলা ওরফে ফজল কুলি খানকে দত্তক নেন। নিঃসন্তান দম্পতির সবটুকু ভালোবাসা ছিল তার প্রতি। ইকরাম বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যান। তার এ মৃত্যু মেনে নিতে পারেননি নওয়াজিশ। শোকে অভিভূত হয়ে জাগতিক সব কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন তিনি। দ্রুত অবনতি ঘটে তার স্বাস্থ্যের। নবাব আলিবর্দি খান তার ভাইয়ের সন্তানদের নিজের সন্তান হিসেবেই দেখতেন। এরই মধ্যে তিনি একজনকে হারিয়েছেন। নওয়াজিশের অবস্থা দেখে তিনি চিন্তিত হলেন। তিনি তাকে নিজ প্রাসাদে নিয়ে এলেন। সেখানে তার যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তাকে খুশি করার জন্য নবাব ইকরাম-উদ-দৌলার শিশুপুত্র মুরাদ-উদ-দৌলাকে ঢাকার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। নওয়াজিশ মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন। ঘসেটি বেগমের মনে ভয় ছিল, তার স্বামীর মৃত্যুর পর হয়তো সিরাজ-উদ-দৌলা তাকে বন্দি করে রাখবেন। তিনি তার স্বামীকে নিয়ে গোপনে আলিবর্দির প্রাসাদ ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে ঘসেটি বেগমের মালিকানাধীন একটি অতিথিশালায় নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান মৃত্যুবরণ করেন।

নবাব আলিবর্দি খান তখন মুমূর্ষু। শাসনক্ষমতা মূলত সিরাজ-উদ-দৌলার হাতে। নওয়াজিশ খান বিগত হয়েছেন। ঘসেটি বেগম আছেন মতিঝিলে। তিনি জানেন, সিরাজ-উদ-দৌলা নবাব হলে কেবল তাকে অপমানই করবেন না, তার সম্পত্তিও ছিনিয়ে নেবেন। তিনি সিরাজ-উদ-দৌলার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তার নাতি মুরাদ-উদ-দৌলার নাম ঘোষণা করেন। স্বামীর রেখে যাওয়া সৈন্যদের তিনি হাতি ও প্রচুর টাকা দেন। এভাবে তিনি নিজের এক বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। সেনাপ্রধান হন মীর নাজির আলী। রাজা রাজবল্লভ হলেন প্রধানমন্ত্রী।

সিংহাসনে আরোহণের ক্ষেত্রে সিরাজ-উদ-দৌলার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন তার খালা ঘসেটি বেগম ও খালাতো ভাই, পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জং। শওকত সিরাজের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তাই সিরাজকে ঠেকাতে তিনি ঘসেটি বেগমের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। নবাব আলিবর্দি খান চাইছিলেন, যেকোনো মূল্যে সিরাজ-উদ-দৌলাকে সিংহাসনে বসাতে। তাই তিনি স্বীয় প্রভাব খাটিয়ে রাজদরবারের প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ সভাসদদের সিরাজের পক্ষে নিয়ে আসেন। তার আত্মীয় মীর জাফরকেও তিনি পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে শপথ করিয়েছিলেন, সিরাজকে সমর্থন করার জন্য। সিরাজ-ঘসেটি বিরোধ মেটাতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু বিষয়টির কোনো মীমাংসা হওয়ার আগেই, ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল নবাব আলিবর্দি খান পরলোক গমন করেন।

আলিবর্দি খানের মরদেহের সৎকার হতে না হতেই সিরাজ-উদ-দৌলা নিজেকে বাংলার নবাব ঘোষণা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার তখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, যা যুদ্ধের প্রধান চালিকাশক্তি। তাই তিনি ঘসেটি বেগমের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার একটি কৌশল অবলম্বন করেন। মীর নাজির আলীর ছিন্ন মস্তক পাঠানোর জন্য তিনি ঘসেটি বেগমকে আদেশ দেন। সিরাজ অভিযোগ উত্থাপন করেন, মীর নাজির আলী রাজপরিবারের সম্মান নষ্ট করেছেন। ঘসেটি বেগম সিরাজ-উদ-দৌলার আদেশ অমান্য করেন। ফলে সিংহাসনে আরোহণের পরদিনই তিনি মতিঝিল অবরোধ করেন। তিনি এমনভাবে তা ঘেরাও করেন কারো পক্ষে সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। নবাবের প্রতিনিধি হিসেবে তার নানি শরফুন্নেসা এবং সভাসদ জগৎ শেঠ প্রাসাদের ভেতরে যান। তারা ঘসেটি বেগমকে আত্মসমর্পণ করতে প্ররোচিত করেন। তারা তাকে নিশ্চয়তা দেন, তাকে হত্যা করা কিংবা তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কোনো ইচ্ছা সিরাজ-উদ-দৌলার নেই। ঘসেটি বেগম এক শর্তে রাজি হন। তিনি দাবি করেন, মীর নাজির আলীকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে এবং নিরাপদে বাংলা ত্যাগ করতে দিতে হবে। সিরাজ-উদ-দৌলা দাবি মেনে নেন। তার নির্দেশে মীর নাজির আলীকে নিরাপদে বাংলার সীমান্ত পার করিয়ে দেয়া হয়। ঘসেটি বেগম মতিঝিল থেকে বের হয়ে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে নবাব তাকে বন্দি করেন এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। শুরু হয় নবাব মহলে ঘসেটি বেগমের অন্তরীণ জীবন।

ঘসেটি বেগমের বিরুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলা বিনা যুদ্ধে

● এরপর পৃষ্ঠা ৫

সিরাজ-লুৎফুন্নেসা ও তাদের বংশধারা

শাকেরা তাসনীম ইরা

বেগম লুৎফুন্নেসা ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার স্ত্রী। সাহস ও আত্মসম্মানের মূর্ত প্রতীক হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। আলো ঝলমল রাজ্য থেকে ফকিরের বেশে মহানন্দার বুকে ভেসে বেড়ানো পর্যন্ত পুরোটা সময় তিনি ছিলেন সিরাজের পাশে। সিরাজের মৃত্যুর পরও তার স্মৃতি আঁকড়েই কাটিয়েছেন বাকি জীবন।

বাংলার নবাবি আমলের ইতিহাস নিয়ে লেখা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বই 'সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন্'। বইয়ের লেখক গোলাম হোসেন বলছেন, 'লুৎফা' (লুৎফুন্নেসা) ছিলেন 'জারিয়া'—বাঁদি।

কিংবদন্তি আছে, সিরাজ-উদ-দৌলা প্রথম দর্শনেই লুৎফুন্নেসার রূপের প্রেমে পড়ে যান। তবে লুৎফুন্নেসা সহজে তাকে গ্রহণ করেননি; শর্ত দিয়েছিলেন বিয়ে করার। সিরাজ প্রথমে শর্ত মেনে নিতে না চাইলেও পরে নানা ঘটনাপ্রবাহে লুৎফার প্রতি গভীর প্রেম জন্মায় সিরাজের মনে। নবাব আলিবর্দি খানের স্ত্রীর কাছে লুৎফাকে বিয়ে করার অনুমতি চান তিনি। প্রথমে বেগম ও নবাব আপত্তি তুললেও পরে বুঝতে পারেন, সিরাজকে সংযত রাখতে লুৎফার প্রভাব প্রয়োজন।

ঐতিহাসিকরা অবশ্য বলেন লুৎফুন্নেসা সিরাজের 'মুৎআ বেগম' কিংবা উপপত্নী। কারণ সমসাময়িক কোনো দলিল-দস্তাবেজে তাদের বিয়ে নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য পাওয়া যায় না। অন্যদিকে শাহি ঘরানার নিয়ম মেনে অল্প বয়সেই ওমদাতুন্নেসার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সিরাজের। মির্জা ইরাজ খাঁ ছিলেন সিরাজের শ্বশুর। যদিও নিজের দুঃসময়ে তাকে পাশে পাননি বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব।

সিরাজের মৃত্যুর পর কোম্পানি তার স্ত্রীকে ৫০০ টাকা পেনশন দিয়েছিল। নিজামত দলিলে বেগমের জায়গির আর এ পেনশনের উল্লেখ পাওয়া যাবে। পেনশন দেয়া হয়েছিল লুৎফুন্নেসাকেও। তবে মাত্র ১০০ টাকা। সে হিসেবে অনুমান করাই যায় যে দালিলিক কোনো প্রমাণ সিরাজ-উদ-দৌলা ও লুৎফুন্নেসার বিয়ের নেই।

বেগম লুৎফুন্নেসার সঙ্গে সিরাজ-উদ-দৌলার কবে বিয়ে হয়েছিল সে সম্পর্কে শতভাগ সঠিক কোনো বর্ণনাও পাওয়া যায় না। তবে এ নারীই যে সিরাজের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন, সে প্রমাণের কোনো অভাব নেই।

সিরাজ-উদ-দৌলা ও লুৎফুন্নেসার উম্মে জোহরা নামের এক কন্যাসন্তান ছাড়া আর কোনো সন্তান ছিল বলে ইতিহাসে উল্লেখ নেই। সিরাজের মৃত্যুর পর এ মেয়েকে নিয়ে জিঞ্জিরার দুর্গে লুৎফুন্নেসা বন্দি জীবনযাপন করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

আট বছর বন্দি জীবনযাপন করার পর সিরাজের পরিবারের নারীরা মুর্শিদাবাদে ফিরে যাওয়ার অনুমতি পান। বেগম লুৎফুন্নেসা তার একমাত্র সন্তান উম্মে জোহরাকে সঙ্গে নিয়ে শেষ জীবনে মুর্শিদাবাদেই বসবাস করেছেন।

সিরাজ-উদ-দৌলার কন্যা উম্মে জোহরার বিয়ে হয়েছিল তারই চাচাতো ভাই মুরাদ-উদ-দৌলার সঙ্গে। তবে শাহজাদা মুরাদ ও শাহজাদি উম্মে জোহরার বংশধরদের সম্বন্ধেও শতভাগ সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

পলাশী ট্র্যাজেডির ২৩৪ বছর পর আবদুল হাই শিকদারের

লুৎফুন্নেসা বেগম

লেখা 'সিরাজউদ্দৌলা : মুর্শিদাবাদ' বইয়ে সিরাজের একজন বংশধরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সে বইয়ের ৮৭-৮৮ পৃষ্ঠায় লেখক বাংলার তদানীন্তন গভর্নরকে লেখা আহসান মঞ্জিলের নবাব সলিমউল্লাহর এক চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন। সে চিঠিতে পত্রবাহক সৈয়দ জাকি রেজা নামক সিরাজ-উদ-দৌলার এক বংশধরের জন্য চাকরির সুপারিশ করেছিলেন স্যার সলিমউল্লাহ।

তৎকালীন গভর্নর মি. সামানকে পাঠানো সে চিঠির শুরুতে লেখা ছিল—

'পত্রবাহক মি. সৈয়দ রেজা জাকি নামক এই তরুণ ভদ্রলোকটিকে আপনার নিকট পরিচয় করিয়ে দিতে আমার আনন্দের অবধি নেই। আমি তার ভবিষ্যতের ব্যাপারে অতিশয় আগ্রহী এবং আপনি তার বিষয়টা সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করবেন, এই আগ্রহ নিয়ে তার বিষয়টা আপনার কাছে সুপারিশ করছি। এই তরুণ ভদ্রলোক (নবাব) সিরাজ-উদ-দৌলা ও সৈয়দ আহমেদ রেজা খানের সরাসরি বংশধর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য, বিশেষ করে প্রথম দিকে বাঙলায় কোম্পানির রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই (শেষোক্ত) ব্যক্তির অবদান সুবিদিত ও মূল্যবান...'

আবদুল হাই শিকদার আবার তার সে বইয়ে প্রকাশ করা চিঠিটি প্রসঙ্গে আবদুল হালিম রচিত 'মুর্শিদাবাদ ও সিরাজ পরিবার' নামের একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকেই বইয়ে সিরাজ-উদ-দৌলার বংশধরদের বর্ণনা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন আবদুল হাই শিকদার।

স্যার সলিমউল্লাহর চিঠিতে উল্লেখিত সৈয়দ জাকি রেজা যে সৈয়দ রেজা খান মোজাফ্ফর জংয়ের ভাই সৈয়দ আহমদ খানের একজন অধস্তন বংশধর সে তথ্য পাওয়া গেছে সেখানেই।

আবার সৈয়দ রেজা খান সম্পর্কে 'সিয়ার-ই, ৩য় খণ্ডে' বলা হয়েছে, রেজা খানের বড় ভাই ছিলেন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক মোহাম্মদ হোসেন খান। তার ছেলে জাকি খানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রেজা খানের মেয়ের। খুব সম্ভবত এদেরই ছেলে ছিলেন নবাব সলিমউল্লাহর পত্রে উল্লেখিত সৈয়দ জাকি রেজার পূর্বপুরুষ। রেজা খানের এ নাতি সম্ভবত নানার নামই গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণেই সম্ভবত নবাব সলিমউল্লাহ তাকে সিরাজ-উদ-দৌলা ও সৈয়দ রেজা খানের সরাসরি বংশধর বলে অভিহিত করেছেন।

উম্মে জোহরা ও মুরাদ-উদ-দৌলার চার মেয়ে এবং একটি ছেলেসন্তান ছিল। সম্প্রতি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বংশধারা সম্পর্কিত যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে, তারা মূলত উম্মে জোহরা ও মুরাদ-উদ-দৌলা দম্পতির পুত্র মির্জা শশমির আলি খানের বংশপরম্পরা।

মির্জা শশমিরের ছেলে মির্জা লুৎফে আলি খান ১৮৩৩ সালে মারা যান। লুৎফে আলির মেয়ে ফাতিমা বেগমের সন্তান সৈয়দ আলি রেজা। সৈয়দ আলি রেজার সন্তান সৈয়দ জাকি রেজা। সৈয়দ জাকি রেজার কথাই চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন নবাব সলিমউল্লাহ।

সৈয়দ জাকি রেজার সাত সন্তানের একজন সৈয়দ রেজা আলি। তার সন্তান সৈয়দ গোলাম মোহাম্মদ ও সৈয়দ গোলাম মোস্তফা।

এছাড়া নিখিলনাথ রায় রচিত 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' নামক বইয়ে সিরাজের চার নাতনি তথা উম্মে জোহরার চার কন্যার উল্লেখ পাওয়া যায়—

'লুৎফুন্নেসার জীবিতকালেই তাহার কন্যা উম্মে জোহরার মৃত্যু হয়। সেজন্য লুৎফুন্নেসার মৃত্যুর পর উম্মে জোহরার চার মেয়ে সরীফন্নেসা, অসামতন্নেসা, সাকিনা ও উম্মতুলা মেহদি বেগম খোশবাগ প্রভৃতির তত্ত্বাবধানের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।'

বেগম লুৎফুন্নেসা ও তার মেয়ে উম্মে জোহরা ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার জীবনের শেষ আশ্রয় এবং উত্তরাধিকারী। পলাশীর বিপর্যয়ের পরে সিরাজের পরিবার যে দুঃসহ জীবনযাপন করেছে, তা এক করুণ ইতিহাসের সাক্ষ্য। বন্দিত্ব, অবজ্ঞা ও অপমানের মধ্যেও লুৎফুন্নেসা তার সন্তানকে রক্ষা করে গেছেন, বাঁচিয়ে রেখেছেন সিরাজের রক্তধারা। ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম আজ অনেকটাই ম্লান হলেও উম্মে জোহরা ও মুরাদ-উদ-দৌলার বংশধরদের হাত ধরে সিরাজ-উদ-দৌলার উত্তরাধিকারী রক্তের ধারা প্রবাহিত হয়েছে বাংলায়ই।

তথ্যসূত্র : *নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (২০১৫)

শাকেরা তাসনীম ইরা : সহসম্পাদক, বণিক বার্তা

ঘসেটি বেগম

● ৪ পৃষ্ঠার পর

জয়লাভ করেন। তবে ঐতিহাসিকদের মতে, এ যুদ্ধে ঘসেটি বেগমের জয়ী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। সিরাজের সঙ্গে টক্কর দেয়ার মতো শক্তি ও সাহস, কোনোটিরই কমতি ছিল না তার। তার এ পরাজয়ের কারণ হিসেবে ইতিহাসে কিছু ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। ঘসেটি বেগমের সৈন্যরা রাতারাতি শিবির বদল করে সিরাজের পক্ষে চলে আসে। ধারণা করা হয়, এ ব্যাপারে নবাবের সঙ্গে মীর নাজির আলীর গোপন এক চক্রান্ত হয়েছিল।

ঘসেটি বেগম অধ্যায় শেষ করে নবাব মনোযোগ দেন পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জংয়ের দিকে। শওকত জং সিরাজ-উদ-দৌলাকে নবাব হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। তিনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রাজমহলের কাছে শওকতের সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হন নবাব। যুদ্ধে শওকত জং পরাজিত ও নিহত হন।

ঘসেটি বেগম ও শওকত জংকে পরাজিত করার পর সিরাজ-উদ-দৌলার আর কোনো পুরনো শত্রু রইল না। তবে নিজেকে সর্বেসর্বা বানাতে গিয়ে তিনি কিছু নতুন শত্রু তৈরি করে ফেলেন। দরবারের কয়েকজন প্রভাবশালী সভাসদ তার বিরুদ্ধে চলে যান। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন মীর জাফর। তারা নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজের সঙ্গে আঁতাত করেন। এ পর্যায়ে পুনরায় নবাবের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠেন ঘসেটি বেগম। তিনি মীর জাফরকে সমর্থন করেন।

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলা পরাজিত হন। মীর জাফরের নিষ্ঠুর পুত্র মিরানের নির্দেশে সিরাজ-উদ-দৌলাকে হত্যা করা হয়। ইংরেজদের একনিষ্ঠ ভৃত্য হিসেবে মুর্শিদাবাদের মসনদে আসীন হন বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর আলী খান। কিন্তু ঘসেটি বেগমের শেষ রক্ষা হলো না। উচ্চাভিলাষী ঘসেটি বেগমকে মিরান অন্যতম হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেন। নবাব পরিবারের অন্য নারীদের সঙ্গে তাকেও বন্দি করে নৌপথে ঢাকার জিঞ্জিরা কারাগারে নিয়ে আসা হয়। মিরানের নির্দেশে সেখানে হত্যা করা হয় তাকে। আর এক কুখ্যাত নারী হিসেবে ইতিহাসে ঠাঁই হয় মেহের-উন-নিসা ওরফে ঘসেটি বেগমের।

নিজাম আশ শামস : লেখক ও অনুবাদক

সিরাজ-উদ-দৌলার

● ২ পৃষ্ঠার পর

বছর ধরে সাঈদ আহমদ খানের দিওয়ান, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাই তার এই বর্ণনাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলা যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে সাঈদ আহমদের অন্য দুই ভাইয়ের জন্মতারিখ সম্বন্ধেও ধারণা করা যেতে পারে। এই হিসাবে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোহাম্মদ রেজা, অর্থাৎ নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান খুব সম্ভব ১৬৯২ কি ১৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে এবং তাদের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহাম্মদ হাশিম, অর্থাৎ জয়েন-উদ-দীন আহমদ খান ছিলেন সাঈদ আহমদ খানের চেয়ে বেশ কয়েক বছরের ছোট।

হাজি আহমদের এই তিন পুত্রের বিয়ে হয়েছিল তার কনিষ্ঠ মির্জা মোহাম্মদ আলির (পরে আলিবর্দি খান) তিন কন্যার সঙ্গে। জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ রেজা, অর্থাৎ নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান শাহাম্মত জঙের বিয়ে হয়েছিল আলিবর্দি খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা মেহের-উন-নিসা ওরফে ঘসেটি বেগমের সঙ্গে। দ্বিতীয় পুত্র সাঈদ আহমদ খানের, অর্থাৎ সওলত জঙের বিয়ে হয়েছিল আলিবর্দি খানের দ্বিতীয় কন্যার সঙ্গে।

আলিবর্দি খানের তৃতীয় ও কনিষ্ঠ কন্যার নাম ছিল আমিনা বেগম। তার বিয়ে হয়েছিল হাজি আহমদের কনিষ্ঠ পুত্র জয়েন-উদ-দীন আহমদ খান হয়বত জঙের সঙ্গে। এ বিয়েটা কবে এবং কোথায় হয়েছিল, তা জানা না গেলেও এ ভাগ্যহীন দম্পতির সন্তানই ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নৃপতি হতভাগা নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা।

হাজি আহমদের পুত্রদের বয়স সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেলেও আলিবর্দি খানের কন্যাদের বয়সের ব্যাপারে সমসাময়িক কালে রচিত ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে নীরব ও নির্বিকার থাকার কারণে এ-সংক্রান্ত জটিলতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এ ব্যাপারে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার জন্মতারিখ পরোক্ষভাবে হলেও সমস্যা সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে বলে সেই আলোচনা আগে করা হলো।

সিরাজ-উদ-দৌলার জন্ম সম্বন্ধে সিয়ার রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন খান বলেছেন, আলিবর্দি খান যখন রাজমহলে ফৌজদার পদে নিযুক্ত হয়ে সেখানেই অবস্থানরত, তখন ১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তার তৃতীয় কন্যা আমিনা বেগম একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। শিশুটিকে আলিবর্দি খান নিজের সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন। সেই সৌভাগ্যটা ছিল এই যে বিশেষ কোনো কারণে বিহার সুবাহর সুবাদারির দায়িত্বও বাংলা ও ওড়িশার সুবাদার নবাব সুজা খানের ওপর অর্পিত হয় সমাট মোহাম্মদ শাহর এক আদেশে। নবাব সুজা খান আলিবর্দি খানকে বিহার সুবার নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত করেন। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে এবং সেই বছরই যে শিশু সিরাজ-উদ-দৌলার জন্ম হয়েছিল বলে সিয়ার রচয়িতা বলেছেন, সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সিয়ার রচয়িতা কর্তৃক প্রদত্ত এ তথ্য অবলম্বন করেই পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকেরা ১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দকেই নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার জন্মতারিখ বলে ধরে নিয়েছেন।

কিন্তু সিয়ার রচয়িতা কর্তৃক প্রদত্ত এ তথ্য যে ভুল, সেই প্রমাণ পাওয়া গেছে আলিবর্দি খানের একজন নিকটাত্মীয় এবং তারই গৃহে জন্মগ্রহণকারী, বসবাসকারী ও তারই আশ্রয়ে বড় হওয়া একজন ঐতিহাসিকের রচিত গ্রন্থ থেকে। সেই ঐতিহাসিক ছিলেন মোজাফফরনামা রচয়িতা ও পরবর্তীকালে ঘোড়াঘাটের ফৌজদার করম আলি খান। তিনি মোজাফফরনামায় লিখেছেন :

হাজি সাহেবের তিন পুত্র নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান শাহাম্মত জং, সাঈদ আহমদ খান সওলত জং ও জয়েন-উদ-দীন আহমদ খান হয়বত জঙের জন্মতারিখ সম্পর্কে যে আলোচনা আগে করা হয়েছে, তাতে সেখানে দেখানো হয়েছে, ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ৬২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণকারী সাঈদ আহমদ খানের জন্ম হয়েছিল ১৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ও তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান জন্মেছিলেন ১৬৯১ কি ১৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে। তাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়েন-উদ-দীন আহমদ খান খুব সম্ভব সাঈদ আহমদ খানের চেয়ে বেশ কয়েক বছরের ছোট ছিলেন। ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বাসঘাতক আফগান সেনাপতিদের হাতে নিহত হওয়ার সময় সিয়ার-এ তাকে তরুণ শাসনকর্তা বলা হলেও তার বয়স তখন ৪০ বছরের ওপরে ছিল বলে ধরা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে তার জন্ম ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের সামান্য পরে হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

মারাঠা দস্যু ভাস্কর পণ্ডিত ও তার ২২ জন সেনাপতিকে প্রতারণামূলকভাবে আলিবর্দি খান হত্যা করিয়েছিলেন রাজা জানকীরাম ও আফগান সেনাপতি মোস্তফা খানের সাহায্যে এবং নবাব মোস্তফা খানকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ভাস্কর পণ্ডিতদের হত্যা করার পর তাকে বিহার সুবাহর নায়েব নাজিমের পদ প্রদান করা হবে। কিন্তু কার্যোদ্ধারের পর নবাব তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার কারণে মোস্তফা খান বিদ্রোহী হন এবং মুর্শিদাবাদে কিছু করতে পারবেন না জেনে তিনি আজিমাবাদ-পাটনায় গিয়ে আক্রমণ করেন সেখানকার শাসনকর্তা শাহজাদা সিরাজ-উদ-দৌলার পিতা এবং নবাব আলিবর্দি খানের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা জয়েন-উদ-দীন আহমদ খান হয়বত জং বাহাদুরকে। তিনি মোস্তফা খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত ও হত্যা করেন।

[আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া রচিত *নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা* বই থেকে সংকলিত]

সিরাজ ও আলেয়া বেগম

● ৭ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশ পায় তার রচিত যুগলকিশোরের দস্যু দমন ও বিচারের ফল। উল্লেখ্য, তৎকালীন ভারতীয় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ময়মনসিংহ ইতিহাস গ্রন্থ রচনায়ও প্রসন্নের ভূমিকা অতিগুরুত্বপূর্ণ।

এবার আসি প্রসন্নকুমার দের গল্পে। প্রসন্নকুমারের তিন স্ত্রীর মাঝে বড় স্ত্রীর ত্রিপুরেশ্বরী দেবীর ঘরে জন্ম নেয় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। তবে এক দুর্ঘটনায় তার প্রথম স্ত্রী গত হলে আত্মীয়রা প্রসন্নকে এ ব্যাপারে দায়ী করে। সন্দেহের জেরে মামলা টানা হলেও তা ধোপে টেকে না শেষাবধি। তবে এ মামলা চলাকালীন উপেন্দ্রকিশোরকে তার মায়ের বাড়ির লোকেরা বরিশালে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে প্রসন্ন আবারো বিয়ে করেন। এ পক্ষে তার দুই পুত্র ও এক কন্যাসন্তান হয়। পুত্রের নাম নলিনী কিশোর রাখা হলেও পরে তিনি বিজয়কুমার বলে পরিচিত হন। আর দ্বিতীয়জনের নাম দেয়া হয় হেমন্তকুমার।

প্রসন্নকুমারের প্রথম স্ত্রীর ভাই পুলিশ বিভাগে যোগ দিয়ে সিলেট এসে পুনরায় তাকে ফাঁসাতে চাইলে প্রসন্ন কাজলশাহর জমিদারি ম্যানেজারের কাছে অর্পণ করে সুরমা নদীর পাড়ে সুনামগঞ্জে থিতু হন এবং এখানে জমিদারি ক্রয় করেন আর এর দায়িত্বে তার দ্বিতীয় স্ত্রী ও পুত্র বিজয়কুমার শামিল হন। এ সময়েই তিনি প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী থেকে প্রসন্নকুমার দেতে রূপান্তর হন।

প্রসন্নকুমারের দ্বিতীয় স্ত্রী গত হওয়ার পর তৃতীয় স্ত্রীর কোল আলো করে ছয় পুত্র পূর্ণেন্দুকুমার, ঘনেন্দু, নীরেন্দু, শরবিন্দু, প্রশান্ত ও নওয়ালকুমার এবং এক কন্যাসন্তান জন্মায়। সুনামগঞ্জে শিক্ষাবিস্তারে প্রসন্নকুমার ভূয়সী অবদান রাখেন। তার মাঝে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক জুবলি স্কুল অনন্য। তার উদ্যোগে সুনামগঞ্জে প্রথম স্থাপিত হয় জুবিলি প্রেস। যুগলকিশোর কর্তৃক পরিচালিত ময়মনসিংহ জমিদারিতে বোকাইনগর থেকে নিজ এলাকা পর্যন্ত দেবদারু বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এক বিশাল পদক্ষেপ। এতসবের মাঝেও সাহিত্যের প্রতি টান তার সবসময়ই থেকেছে।

তার ইংরেজিতে রচিত indian bounquet আমেরিকায় প্রকাশিত "Books of poet individual Bengals"-এ স্থান করে নিয়েছে। এ গ্রন্থের শিরোনাম "Mapping the Nation" একজন ভারতীয়ের গৌরববোধ এ কবিতার মধ্য দিয়ে প্রসন্ন উপস্থাপন করেছিলেন। আসামের চিফ কমিশনার স্যার হেনরি জন স্টেডম্যান কটন সম্পর্কে প্রসন্নকুমার দে কবিতা রচনা করায় তাকে ভারতবন্ধু বলা হয়। "The peacock Lute" নামে তার আরো একটি গ্রন্থ আছে তা অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রসন্নকুমারের পরে তার পুত্র বিজয়কুমার সংসারের দায়িত্ব নেন। তিনি ১৯২৬-এ সুনামগঞ্জ থেকে শিলংয়ে চলে যান। সঙ্গে পদও বদল করেন। বিজয় কুমার দের জায়গায় পরিচিত হন বিজয়কুমার লালা দে নামে। তিনি অবশ্য সাহিত্য কিংবা জমিদারিতে নয়। পারদর্শিতা দেখান ওকালতিতে। কলকাতা থেকে আইনের ডিগ্রি লাভ করে তিনি শিলংয়ে ওকালতি শুরু করেন। শিলং বার অ্যাসোসিয়েশনে তিনি পাঁচ বছর সভাপতি ছিলেন। দেশভাগের আগে পরিবারের সবাইকে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেও তার কজন ভাই অবশ্য সুনামগঞ্জেই রয়ে যান।

প্রসন্নকুমারের তৃতীয় স্ত্রীর কথায় আমরা জেনেছি তার গর্ভজাত সন্তানদের বিষয়ে নওয়ালকুমার দে বাদে বাকি সবাই এ সুনামগঞ্জেই রয়ে গিয়েছিল। চতুর্থ ছেলে শরবিন্দু দে ১৯২১-এ গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তাতে যোগ দেন। পরিবারের কাছে তিনি বুনি বাবু বলে পরিচিত ছিলেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বুনি বাবু সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এ অসহযোগ আন্দোলনের আগেই তিনি তরুণ সংঘ নামে একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন। ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিহত করাই ছিল যার মূল উদ্দেশ্য। এ বিপ্লবী দলে দেবেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, চিত্তরঞ্জন দাস, ছোট ভাই প্রশান্ত দে, দীনেশ চৌধুরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাদের হাত ধরেই সুনামগঞ্জের বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে। সুনামগঞ্জ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবেও তিনি সক্রিয় ছিলেন।

১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনের যোগদানের পর তিনি আর বিদ্যালয়ে ফেরেননি। ১৯৩০-৩২-এ আইন অমান্য করে আন্দোলনে যোগ দেয়ায় কারাবরণ করেন। কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস ত্যাগ না করা অবধি শরবিন্দু সুনামগঞ্জ মহকুমা কংগ্রেসের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শরবিন্দুর প্রভাবেই তার পরিবার ব্রিটিশবিরোধী সক্রিয় আন্দোলনের ধারায় জড়িয়ে পড়ে। ইতিহাস যেন বৃত্তের একই কেন্দ্রতে এসে ফের দাঁড়িয়ে পড়ে।

প্রশান্তকুমার দে নিজেও সুনামগঞ্জ বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন। সিলেটের মুরারী চাঁদ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি শেষে তিনি এলাহাবাদে ডিফেন্স অর্ডিন্যান্স অর্গানাইজেশনে যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত আইন অমান্য করে আন্দোলনে শামিল হওয়ায় চাকরি থেকে তাকে পদত্যাগ করতে হয় এবং তিনি সুনামগঞ্জে এসেই আন্দোলনে যোগ দেন। '৪৭-এর ১৫ আগস্টে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও শ্রীহট্ট জেলা গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ পরিবর্তনে প্রশান্তকুমার নিজেকে মানিয়ে নিতে অসমর্থ হন। ১৯৪৮-এ সব কমিউনিস্টকে পাকিস্তানে কারাগারে বন্দি করার সঙ্গে শরবিন্দু ও স্ত্রী সুষমাও গ্রেফতার ও নির্যাতনের শিকার হন।

পরবর্তী সময়ে ভারত ফিরে যাবেন এ শর্তে তাদের মুক্তি দেয়া হলে তারা ১৯৭০-এ ভারতে আসেন এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর শরণাপন্ন হন। তার সহায়তায় তিনি আগরতলায় তাদের বসবাসের জন্য এক টুকরা জমি কিনে দেন। সেখানেই আবাস নির্মাণ করে তারা বাস করেন এবং জীবনের অন্তিম দিনগুলো এখানেই অতিবাহিত করেন।

তবে ইতিহাসের পরিহাস এ নৃপেন চক্রবর্তী শেষ পর্যন্ত জানতে পারেননি তিনি অজান্তেই সিরাজের বংশধরদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে গেছেন। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে শরবিন্দু নামটি এক উজ্জ্বল আত্মত্যাগী চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার এ বংশধারার বিবরণে এলে আশ্চর্য ও হয়রান দুটোই হতে হয়। বর্ণাঢ্য এ যাত্রাপথের গল্প অল্প কথায় বলে শেষ করা অসম্ভব। আলিবর্দি ও সিরাজের চৌকস বুদ্ধি, সরলতা, ঔদার্য আর সহনশীলতা যেন দৃশ্যভাবে বিরাজমান থেকেছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মতরে। জমিদারি দক্ষতা থেকে সাহিত্যের মাঠ বিচরণ আইনের মারপ্যাঁচ হতে শেষে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠা প্রমাণ করেছে দেশপ্রেমিকের রক্তে বহমান দেশপ্রেমের এ ভক্তি চিরশাশ্বত, চিরঞ্জীব। আর যুদ্ধ কেবল মাঠে নেমে নয়, বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-আহরণ ও এর সঠিক প্রয়োগেই নিহিত। এর সঠিক লালন ও পরিবর্ধন বাঙালির ভাবনার সীমাহীন প্রসারণ ঘটিয়ে চলেছে চমৎকারভাবে।
কে জানত নবাবের ঘেঁষে থাকা আলেয়ার সমাধিতে পুঞ্জীভূত আঁধারের মাঝে সুপ্ত এ আলোর ঝিলিক আড়ালে থাকা বংশধারার যাত্রাকথার উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার ইঙ্গিত বহন করে চলেছিল অলক্ষ্যে, অগোচরে।

সোনিয়া তাসনিম : প্রাবন্ধিক

সিরাজ ও আলেয়া বেগম : এক অজানা গল্প

সোনিয়া তাসনিম

কথিত আছে, বিশ্বস্ত সেনাপতি মোহনলালের বোন মাধবী, যিনি কিনা হীরা নামেও পরিচিত ছিলেন তার সঙ্গেই নবাব সিরাজের পরিণয় ছিল। সে সূত্রে হীরার গর্ভে সিরাজের একমাত্র পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। বিষয়টি নবাব আলিবর্দি খানের অগোচরে থেকে যায়। পাছে ঘটনাটি নবাবের ক্রোধের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, এজন্য ভীত সিরাজের নেয়া কিছু পদক্ষেপে মোহনলাল ক্ষুব্ধ হন এবং মুর্শিদাবাদ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তবে সিরাজের জন্য মোহনলালের গুরুত্ব ছিল অনেক। তাই তার এ সিদ্ধান্ত বদল করতে আলিবর্দি খান উদ্যোগী হন। তিনি হীরা তথা আলেয়া বেগমের সঙ্গে সিরাজের বিয়ের আয়োজন ইসলামী রীতি অনুসারে সম্পন্ন করেন। হীরা হন সিরাজের স্ত্রী আলেয়া বেগম।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অমলেন্দু দে দীর্ঘদিন সিরাজ ও আলেয়া বেগমের সম্পর্ক এবং এ দম্পতির বংশপরম্পরা নিয়ে গবেষণা করেছেন। ২০১২ প্রকাশিত হয় তার আলোচিত গ্রন্থ *সিরাজের পুত্র ও বংশধরদের সন্ধানে*। ২০১৪ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এ বিষয়ে তার গবেষণা চালিয়ে গিয়েছিলেন। তার গ্রন্থকে অনুসরণ করে সিরাজ ও আলেয়া বেগমের পুত্র ও বংশধরদের পরিচিতি থাকছে এ লেখায়।

হীরা ধর্মান্তর হয়ে আলেয়া নামে পরিচিত হন। নবাবের প্রাসাদের পাশে যে হীরাঝিল—সেটির নামকরণ এ হীরার নামানুসারে করা হয়। আর আলিবর্দির ইচ্ছানুযায়ী মোহনলালকে সিরাজের পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিতে হয়। মোহনলালের এ দায়িত্ব ইতিহাসের এক অমীমাংসিত অধ্যায়ের সূচনা করে।

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের ভবিতব্য পরিণতি আঁচ করতে পেরে মোহনলাল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সিরাজ তনয়কে নিয়ে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করেন। তিনি যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন না নিহত তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও ধারণা করা হয় তিনি জীবিতই ছিলেন এবং বাসুদেব ও হরন্দর নামক দুজন সহচারী নিয়ে ময়মনসিংহের বোকাইনগর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

তবে ক্লাইভের চতুর অনুসন্ধানের কারণে সেখানে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে গেলে মোহনলাল ময়মনসিংহের জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীকে অনুরোধ করেন সিরাজ পুত্রকে দত্তক নেয়ার জন্য। চৌধুরী তাতে সম্মতিও দান করেন। পরবর্তী সময়ে জমিদারের প্রয়াণের পর মোহনলাল জমিদারপুত্র কৃষ্ণকিশোরকে সিরাজ পুত্রের বিষয়ে একই অনুরোধ করেন। কৃষ্ণকিশোরের এক ছোট ভাই ছিল। এ ছোট ভাই কৃষ্ণগোপাল রায় চৌধুরী নিঃসন্তান থাকায় সিরাজের পুত্রকে দত্তক নিতে আগ্রহী হন এবং আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমেই এ বিধি সম্পন্ন করেন। এ বিধি পালনের উদ্দেশ্য ছিল সিরাজপুত্র যেন কৃষ্ণগোপালের উত্তরাধিকার হন। এরপর পুত্রশিশুটি নতুন পরিচয় পায়, তার নাম হয় যুগলকিশোর রায় চৌধুরী। সময়টা ছিল ১৭৫৮।

১৭৬০-এ কৃষ্ণগোপাল মারা গেলে যুগলকিশোর তার জ্যাঠার তত্ত্বাবধানে জমিদারি পরিচালনায় অভিজ্ঞ ও দক্ষ হতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে জমিদারিতে রথযাত্রার আয়োজনে আচমকা এক দুর্ঘটনায় কৃষ্ণকিশোর মারা গেলে পরিবারে এ রথযাত্রা আয়োজন চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়। জ্যাঠার প্রয়াণের পর যুগলকিশোর দক্ষভাবে জমিদারি পরিচালনাসহ তার জ্যাঠার বিধবা দুই স্ত্রীদের প্রতিও যথাযথ দায়িত্ব পালন করেন।

তবে বিপদ তার পিছু ছাড়ছিল না। ইত্যবসরে জাফরশাহি অঞ্চলে মহামারীর প্রকোপ শুরু হলে যুগলকিশোর তা মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হন। এবং এ জায়গায় বসবাস না করার সিদ্ধান্ত নেন। সে অনুযায়ী যুগলকিশোর গৌরীপুরের বালুরঘাটে উপস্থিত হন। তবে এ অঞ্চলে তখন বনজঙ্গলে পূর্ণ ও নিম্নশ্রেণীর সম্প্রদায়ের আবাসস্থল ছিল। যুগলকিশোরের বিচক্ষণতায় সে স্থানের আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং জীবনযাত্রার মান বাড়ে। প্রজাদের মাঝে তার প্রতি সমীহ তৈরি হয়।

সেকালে ময়মনসিংহে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল চরমে। বিদ্রোহ দমনে সরকার জমিদারদের শরণাপন্ন হলে যুগলকিশোর এক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন। একই সময়ে ময়মনসিংহে বন্যার আঘাতে জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে। একদিকে দেখা দেয় অনাহার, অন্যদিকে শুরু হয় লুটপাট। যুগলকিশোর এ দুর্যোগ সামাল দিতে তৎপর হন। সিন্ধা পরগনার গ্রামে অত্যাচারের মাত্রা বাড়লে সেখানকার জমিদার মুহম্মদ খাঁর কাছে যুগলকিশোর সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু মুহম্মদ খাঁ প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে এ বিশৃঙ্খলা আরো উসকে তোলেন। নিরুপায় হয়ে যুগলকিশোর ১৭৭৯-তে প্রায় পাঁচ হাজার লাঠিয়ালসহ সিন্ধা আক্রমণ করে বসেন এবং তার পদাতিকেরা সিন্ধাতে ব্যাপক অরাজকতা চালায়, যাতে যুগলকিশোরের প্রতিভাপূর্ণ জীবনে কলঙ্ক লেপিত হয়।

মুহম্মদ খাঁর অভিযোগ ও এ ঘটনার তদন্ত জেরে তাকে শাস্তি দান করার জন্য ঢাকায় নেয়ার আদেশ দেয়া হলেও যুগলকিশোরের পূর্ববর্তী সহযোগী আচরণের কারণে রটন সাহেবের অনুরোধে নাসিরাবাদে বিচার কার্য সমাধা করার অনুমতি দেন। তবে বিচারে নৈরাজ্য তৈরিতে সংশ্লিষ্ট থাকার যথাযথ প্রমাণ না পাওয়ায় যুগলকিশোর একটি অঙ্গীকারপত্র লিখে এ থেকে অব্যাহতি পান। তবে বিষয়টি তার আত্মসম্মানের সঙ্গে শারীরিক সক্ষমতায় আঘাত করার

হীরা অথবা আলেয়া বেগম

জন্য যথেষ্টই ছিল।

প্রশাসনিক জীবনের এ টালমাটাল হাওয়া এসে লাগে পারিবারিক আঙিনায়ও। যুগলকিশোরের প্রয়াত জ্যাঠার দুই বিধবার মাঝে পতির জলপিণ্ড সংস্থানের জন্য দত্তক পুত্র গ্রহণে আগ্রহী হওয়ার সঙ্গে তৈরি হয় মনোমালিন্য। যুগলকিশোর মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করলেও তারা এতে কোনো সমাধানে আসতে রাজি হন না। মোকদ্দমার পরিপ্রেক্ষিতে রত্নমালা ও নারায়ণী দেবীর নামে জমিদারি জারি থাকে। তারা যুগলকিশোরের অধিকৃত সম্পদের অর্ধেকের মালিকানা লাভ করেন। রত্নমালা দেবীর মৃত্যু পরবর্তী সময়ে নারায়নী দেবী সম্পদের প্রকৃত উত্তরাধিকার হয়ে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। কেননা কোনো না কোনোভাবে তারা যুগলকিশোর সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। এ সন্দেহ যুগলকিশোরের মাঝেও ছিল, যা তাকে সংশয়ে ফেলে।

যুগলকিশোর রাজশাহীর পাকুরিয়া গ্রামের বিখ্যাত শক্তি সাধক পণ্ডিত মোহন মিশ্রের কাছে কালীমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি নানা রকম ধর্মীয় উন্নয়নকাজে অবদান রাখেন, যা তাকে সাধারণের কাছে শ্রদ্ধা অর্জনে সহায়তা করে। তবে মামলা মোকদ্দমা এবং আত্মপরিচয় নিয়ে আতঙ্ক সর্বদা তার মাঝে বিরাজমান ছিল। তার দৈহিক গঠন, বর্ণ তাকে বাঙালিদের থেকে সহজেই আলাদা করে তুলত, যা তাকে ব্রিটিশ শাসকদের তোপের মুখে ফেলতে যথেষ্ট ছিল। তাই তার গৌরীপুর থেকে শ্রীহট্ট যাওয়ার পরিকল্পনা করে পরিচয় আত্মগোপন করেন এবং ফরিদপুরের যাপুর গ্রামের ভট্টাচার্য বংশের রুদ্রানী দেবীকে বিয়ে করেন এবং তার গর্ভে হরকিশোর, শিবকিশোর নামে দুই পুত্র এবং অন্নদা, বরদা, মোক্ষদা ও মুক্তিদা নামে চার কন্যার জন্ম হয়।

পুত্র হরকিশোর শ্রীহট্ট জেলায় জমিদারি বিস্তৃতি ঘটালেও তা ধরে রাখতে অসামর্থ হন এবং তা বিক্রি করে দেন। গৌরীপুর বাড়ির সৌন্দর্যবর্ধনসহ তিনি রাজশাহীর বৃকুৎসা গ্রাম নিবাসী কাশীনাথ মজুমদারের কন্যা ভাগীরথী দেবীকে বিয়ে করেন। সেখানে তার একমাত্র কন্যাসন্তান কৃষ্ণমনি জন্ম নেয়। কৃষ্ণমনির শৈশবকালে পিতৃবিয়োগে তাবৎ সম্পদ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন পরিচালিত হয়। অতপর আনন্দকিশোর রায় চৌধুরী নামে ভাগীরথী দেবী এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। তবে বাল্যকাল থেকেই আনন্দ ছিল উচ্ছৃঙ্খল ও অপব্যয়ী। যার কারণে ভাগীরথী দেবী পুত্রের ওপর গোটা জমিদারির দায়িত্ব অর্পণ করতে অপরাগ হন। অতঃপর গোটা জমিদারি ভাগীরথী দেবী ও আনন্দের মাঝে সমবণ্টিত হয়।

এ দত্তকপুত্র উচ্ছৃঙ্খল আনন্দকিশোর রায় চৌধুরীর মধ্য দিয়েই যুগলকিশোরের বংশের ধারা অব্যাহত থাকে। সে সূত্রে এখন শ্রীহট্টের দিকে দৃষ্টিপাত করা জরুরি। যুগলকিশোরের প্রথম স্ত্রী রুদ্রানীর দুই পুত্র মারা যাওয়ার পর তিনি যমুনা দেবীকে বিয়ে করেন, যিনি পাবনার পাকুরিয়া গ্রামের গঙ্গাময়ী দেবীর বোন। যমুনা দেবীর গর্ভে প্রাণকৃষ্ণনাথের জন্ম। স্ত্রী-পুত্রসহ তিনি সিলেটের কাজল শহরে গিয়ে সেখানে বিশাল জমিদারি ক্রয় করে পুনরায় জমিদারি শুরু করেন।

তবে এ বেলায় তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকতেন। গৌরীপুরের সে দাপটের গল্প এখানে ক্ষীয়মাণ নদীর স্রোতের মতোই সরু ছিল। যেহেতু শারীরিক গড়নের কারণে যুগলকিশোরকে পাঞ্জাবি বলে মনে হতো। তাই নিজের পরিচয় সম্মুখে প্রকাশ হওয়ার শঙ্কা সবসময় তাকে তাড়া করে বেরিয়েছে। নিজ পরিচয় তিনি তার পুত্র প্রাণকৃষ্ণনাথের সঙ্গে সময়ানুযায়ী আলোচনা করেন। ইংরেজ শাসনামলে এ বিস্ফোরক তথ্য সামনে এলে সমূহ পরিণতি কী হতে পারে তা বিবেচনা করে তারা এ তথ্য গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নেন এবং সবাই সিলেটে একসঙ্গে না থেকে একটি অংশ পদবি পরিবর্তন করে শিলংয়ে পাড়ি জমান এমন তথ্য ময়মনসিংহ ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায়।

যুগলকিশোরের ছেলে প্রাণনাথ চৌধুরী সিলেটের উন্নয়ন সাধনে যথেষ্ট অবদান রাখেন। সিলেট লেক, যুগল আখড়া, ইসকন প্রতিষ্ঠান এসব তার প্রমাণ। প্রাণনাথের প্রথম পুত্র কাজল পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে মাত্র ১২ বছর বয়সে।

দ্বিতীয় পুত্র সৌরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ভিন্ন ধাতুতে গড়া ছিলেন। জমিদারী ব্রিটিশ শাসনের স্রোতের অনুকূলে না গিয়ে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় বিপ্লবী দলের সঙ্গে। যার দরুন তিনি ব্রিটিশ সরকারের বাঁকা নজরে পড়েন। তবে পিতার পরামর্শে নিজ পরিচয় জেনে তিনি পরবর্তী সময়ে বিপ্লবী কার্যক্রমের থেকে সরে গিয়ে শিক্ষা আহরণে মনোনিবেশ করেন এবং এরই মাঝে দুবার নামেরও বদল করেন। প্রসন্ন চন্দ্র রায় চৌধুরী এবং প্রসন্নকুমার দে বলে তিনি দুবার নিজেকে পুনর্জন্ম দেন। অর্থাৎ সৌরেন্দ্র কিশোর, প্রসন্ন চন্দ্র, প্রসন্নকুমার একই অঙ্গে তিনটি পরিচয়ের ধারক।

প্রসন্ন চন্দ্র রায় চৌধুরী কলকাতার হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়ে জুনিয়র স্কলারশিপ লাভ করেন। এ কলেজে বিএ ডিগ্রি লাভ করার সময়ে এটি প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর হয়। এমন তথ্য প্রেসিডেন্সি কলেজ রেজিস্টার থেকে উদ্ধৃত। ধারণা করা হয়, এ কলেজে পড়ার সময়েই তার সঙ্গে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় ঘটে। এটির সত্যতা নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও প্রসন্নকুমার রচিত ইংরেজি কবিতা Is Bankim Dead? সাহিত্যধারায় এক অমূল্য রত্ন সংযোজন করে নেয়। বঙ্কিম প্রয়াণ পরবর্তীকালে প্রথম কোনো বাঙালি কবির এমন শ্রদ্ধাঞ্জলি সত্যি অবাক করার মতো।

সুবিশাল বাংলার অধিপতির রক্তধারা কেবল শাসনযজ্ঞে নয়, বরং সাহিত্য প্রান্তরেও কাঁপন তোলে চিন্তাশীলতা ও কলমের আঁচড়ে। পিতার কাছে জানা যুগলকিশোরের জীবনকাহিনী প্রসন্নকে আলোড়িত করেছিল দারুণভাবে। তার ভিত্তিতে তিনি বোরাইনগরের ইতিবৃত্ত প্রবন্ধ রচনা করেন, যা কিনা প্রকাশিত হয় জাহ্নবী নামক বিখ্যাত বাংলা পত্রিকায়। ভারতী পত্রিকায়

● এরপর পৃষ্ঠা ৬

এক্সিম স্মার্ট রিসিট

মান্থলি প্রফিট মুদারাবা ডিপোজিট স্কিম

ব্যাংকিং হবে স্মার্ট কার্ডে

*মূল বৈশিষ্ট্য:

- স্মার্ট কার্ডে মান্থলি প্রফিট
- প্রতি মাসের মুনাফা কার্ডে ব্যালেন্স আকারে যুক্ত হবে
- মুনাফার টাকা কার্ডের মাধ্যমে ATM থেকে উত্তোলন, কেনাকাটায় কিংবা বিল পরিশোধে POS এর মাধ্যমে ট্রানজ্যাকশন করা যাবে
- কার্ড অ্যাক্টিভেশনে তাৎক্ষণিক ৫০০ টাকা বোনাস
- মূল টাকার ৯০% পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা

EXIM BANK
শরী'আহ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক
অব বাংলাদেশ পিএলসি.

*শর্ত প্রযোজ্য

সব ধরনের ব্যাংকিং তথ্যের জন্য 16246

www.eximbankbd.com

সম্পাদক : দেওয়ান হানিফ মাহমুদ; বিজবাংলা মিডিয়া লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ কর্তৃক বিডিবিএল ভবন (লেভেল ১৭), ১২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত এবং টাইমস মিডিয়া লিমিটেড, ১৩৬, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত। বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : পিএবিএক্স : +৮৮-০২ ৫৫০১৪৩০১-০৬, +৮৮-০২ ৫৫০১৪৩০৮-১৪, ফ্যাক্স : +৮৮-০২ ৫৫০১৪৩১৫, ই-মেইল : news@bonikbarta.com, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ : ফোন : +৮৮-০২ ৫৫০১৪৩০৮-১৪, ই-মেইল : silkroute@bonikbarta.com